The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-6 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century, 3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

সংস্কৃত নাটকের স্বরূপ বিশ্লেষণ

[Analizing the form of Sanskrit Drama]

Dr. Baby Biswas
Professor, Department of Sanskrit, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-6
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 10 March 2025
Received in revised: 24 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Sanskrit Poetry, Dasharūpaka, Nātakā, Pancha-sandhi, Pancha-arthaprakriti, Panchabastha.

ABSTRACT

According to Indian theory of poetry, literature is somehow synonymous to poetry. Any composition of the poets belongs to literature either it may be rhythmic or not. In Sanskrit literature, this poetry has been divided into two parts: Drishyakavya and Srabyakavya. The poetry which is enjoyed by listening is called Srabyakavya. On the other hand drama played by some characters on the stage through dialogues and audience enjoy it live. Drama of Bengali literature and the drama from English literature are called Drishyakavya or Rūpaka in Sanskrit literature. Again, it may be called Rūpaka because it indicates a meanning of a character to other characters through acting. According to the theory of drama, Rūpaka has been divided into ten parts: Nātakā, Prakarana, Bhāna, Vyāyoga, Samavakāra, Dima, Ihāmrga, Anka, Vithi and Prahasana. It is called Dasharūpaka as it is divided into ten metaphoric parts. Nātakā occupies the first position among these ten kinds of Rūpaka. In this article, the form of Nātakā in Sanskrit, has been analized considering its strory, the source of story, the expansion of stories, its devidation of chapter, its humour and its characterstics aspects.

ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব অনুসারে সাহিত্য শব্দের প্রতিশব্দ হল কাব্য। কবির ছন্দোবদ্ধ বা ছন্দোহীন যে কোন রচনাই কাব্য বা সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। সংস্কৃত সাহিত্যে এই কাব্যকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে— দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। যে কাব্য শুধু শ্রবণ করা যায় তাকে শ্রব্যকাব্য বলে।[১] আবার কুশীলবের অভিনয়ের মাধ্যমে সংলাপরূপী যে কাব্য শ্রবণের পাশাপাশি মঞ্চে দেখতে পাওয়া যায় তাকে দৃশ্যকাব্য বলে।[২] বাংলা সাহিত্যের নাটক, ইংরেজি সাহিত্যের Drama-কে সংস্কৃত সাহিত্যে দৃশ্যকাব্য বলে। আবার কুশীলবের অভিনয়ের মাধ্যমে একের রূপ অন্যের উপর আরোপিত হয় বলে একে রূপকও বলা হয়।[৩] নাট্যতত্ত্ব অনুসারে এই দৃশ্যকাব্য বা রূপককে দশটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথা— নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথী ও প্রহসন। রূপকের এই দশটি শ্রেণির মধ্যে প্রথমটির নাম নাটক।

ভাসের *প্রতিমা*, *অভিষেক*, *দূতবাক্য*, *কর্ণভার*, *দূতঘটোৎকচ*, *মধ্যমব্যায়োগ*, *স্বপ্নবাসবদত্তা*; কালিদাসের *মালবিকাগ্নিমিত্র*, *অভিজ্ঞানশকুন্তল* ও *বিক্রমোর্বশীয়*; ভবভূতির *উত্তররামচরিত* ও *মহাবীরচরিত*, ভট্টনারায়ণের *বেণীসংহার*, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি রূপকগুলো নাটক হিসেবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় সংস্কৃত নাটকের স্বরূপ বিশ্লেষণ। সংস্কৃত নাটকের পরিধি অনেক ব্যাপক হওয়ায় সংস্কৃত নাটকের স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভবভূতির *মহাবীরচরিত* নাটকটি বেছে নেওয়া হয়েছে। নাট্যতত্ত্বের অলোকে সংস্কৃত *মহাবীরচরিত* নাটকের স্বরূপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। আলোচ্য প্রবন্ধে নাট্যতত্ত্বের অলোকে সংস্কৃত *মহাবীরচরিত* নাটকের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে হলে প্রথমেই আমাদের নাটকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা দরকার। সাত্যিদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ নাটকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন— নাটকের বৃত্তান্ত বিখ্যাত ও পঞ্চসন্ধি-সংযুক্ত হবে; এতে বিলাস, ঋদ্ধি প্রভৃতি গুণ থাকবে এবং এটা নানাবিভূতিযুক্ত হবে। এতে সুখ-দুঃখের উৎপত্তি প্রদর্শিত হবে এবং এটা নানারসে পরিপূর্ণ হবে, এতে পাঁচ হতে দশ পর্যন্ত অঙ্ক থাকবে। এর নায়ক হবেন কোনো বিখ্যাত বংশজাত ব্যক্তি, রাজর্ষি, ধীরোদাত্তগুণসম্পন্ন বা প্রতাপশালী ব্যক্তি; দিব্য বা দিব্যাদিব্য-এরূপ গুণবান ব্যক্তি। নাটকে শৃঙ্গার বা বীর যে-কোনো একটি রস অঙ্গীরস (প্রধানরস) ও অন্যান্য রসসমূহ অঙ্গরস (অপ্রধান রস) হিসেবে থাকবে; নির্বহণ সন্ধিতে অদ্ভুত রসের প্রয়োগ করতে হবে, কার্যসাধনে চার বা পাঁচ জন প্রধান পুরুষ থাকবে। এর বন্ধন গোপুচ্ছের অগ্রভাগের মত হবে।[৪]

অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসারে যে-কোনো দৃশ্যকাব্যকে নাটক বলা যাবে না। নাটকীয় কাহিনি এবং নাটকীয় ক্রিয়া— এ দুটির সমন্বয়ে নাটক সৃষ্টি হয়। সাহিত্যদর্পণে নাটকীয় কাহিনির পাঁচটি উপাদান (বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য) এবং পাঁচটি নাটকীয় ক্রিয়ার স্তর (আরম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম) স্বীকৃত। নাটকের এই পাঁচটি কাহিনির উপাদানকে পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি, আর পাঁচটি নাটকীয় ক্রিয়ার স্তরকে পঞ্চাবস্থা বলা হয়। এই পঞ্চ অর্থপ্রকৃতি ও পঞ্চাবস্থার

সঙ্গে যুক্ত থাকে পঞ্চসন্ধি। সুতরাং নাটককে সার্থক হতে হলে এসব বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। তাছাড়া মূল পাত্র-পাত্রী মঞ্চে প্রবেশের পূর্বে বিঘ্নবিনাশের জন্য মঙ্গলাচরণের অংশ হিসেবে নাটকে নান্দী-স্তুতি করা হবে। এরপর প্রস্তাবনার মাধ্যমে মঞ্চে মূল পাত্র-পাত্রীর প্রবেশ ঘটানো হবে।[৫] নান্দী, প্রস্তাবনা, অর্থোপক্ষেপক, অর্থপ্রকৃতি, পঞ্চাবস্থা, পঞ্চসন্ধি ও রসসমূহ সম্পর্কে *মহাবীরচরিত* নাটকের স্বরূপ বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। মূলত নাট্যকাহিনির উৎস, কাহিনির বিন্যাস, রস ও চরিত্র— এই কয়টি দিক বিবেচনা করে সংস্কৃত নাটকের স্বরূপ[৬]নির্ণয় করা সম্ভব। ইতিহাস-বিখ্যাত, পুরাণপ্রসিদ্ধ বা লোকপ্রচলিত বিখ্যাত কাহিনিকে উৎস হিসেবে নিয়ে বা অবলম্বন করে নাটক রচিত হবে। যেমন— ভবভূতির *মহাবীরচরিত* নাটক ইতিহাস-বিখ্যাত রামায়ণ কাহিনি অবলম্বনে রচিত।

কাহিনি বিন্যাসের ক্ষেত্রে অধ্যায়-বিন্যাস, সূচনা-সমাপ্তি ও মূল কাহিনির রমণীয়তা ও গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নাটকে সুনির্দিষ্ট কিছু আঙ্গিকের প্রয়োগ করা হয়। মূল কাহিনিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়, যার এক একটি ভাগের নাম অঙ্ক। মহাকাব্যের সর্গ, গদ্যকাব্যের উচ্ছ্বাসই দৃশ্যকাব্যে অঙ্ক নাম ধারণ করে। নাটকের অঙ্কসংখ্যা হবে পাঁচ থেকে দশের মধ্যে। যেমন— ভবভূতির *মহাবীরচরিত* নাটকের অঙ্কসংখ্যা সাত।

নাটকের কাহিনির সূচনায় থাকে নান্দী। দেব, দ্বিজ, নৃপ প্রমুখ প্রণম্যদের আশীর্বাদ-প্রাপ্তিপূর্বক নির্বিঘ্নে দৃশ্যকাব্যের সূচনা-সমাপ্তির উদ্দেশ্যে মঙ্গল শব্দের সাথে সাথে আনন্দজনক যে স্তুতিশ্লোক উচ্চারণ করা হয়, তার নাম নান্দী। এতে মঙ্গলসূচক শঙ্খ, চন্দ্র,পদ্ম, চক্রবাক, শ্বেতপদ্ম প্রভৃতির বর্ণনা থাকবে এবং স্নাদশ বা অষ্ট পদ থাকবে।[৬] যেমন— *মহাবীরচরিত* নাটকে অষ্টপদযুক্ত নান্দী ব্যবহৃত হয়েছে।

অথ স্বস্থায় দেবায় নিত্যায় হতপাপ্মনে।
ত্যক্তক্রমবিভাগায় চৈতন্যজ্যোতিষে নমঃ ॥[৭]

—অর্থাৎ যিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, সনাতন, অপাপবিদ্ধ, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের ক্রমরহিত, সেই চৈতন্য জ্যোতির্ময় পরমেশ্বরকে নমস্কার।

সবধরনের বিঘ্নবিনাশের লক্ষ্যে সাধারণত নান্দী পাঠ করা হয়। কিন্তু নান্দী শ্লোকের মাধ্যমে প্রথিতযশা নাট্যকারগণ নাটকের বিভিন্ন চরিত্র এমনকি বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেন। ভবভূতির *মহাবীরচরিত* নাটকের নান্দীর মধ্যেও এমন আভাস পাওয়া যায়। আটটি পদের শাব্দিক অর্থ বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়— 'অথ' শব্দের অর্থ তারপর। কিন্তু শুরুতে ব্যবহার করায় মাঙ্গলিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'স্বস্থায়' বলতে বোঝায় যিনি নিজের মধ্যে বিরাজমান। 'দিব্' ধাতু থেকে দেবশব্দের উৎপত্তি। দিব্ + অচ্ = দেব। 'নিত্য' বলতে বোঝায় চিরন্তন। 'হতপাপ্মনে' এর অর্থ পাপবিনাশকারী। 'ত্যক্তক্রমবিভাগায়' এর অর্থ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের ক্রমরহিত। 'চৈতন্যজ্যোতিষ' অর্থ চৈতন্যরূপ জ্যোতির্ময়। আর নমঃ অর্থ নমস্কার। উক্ত শ্লোকটির অর্থ বিশ্লেষণ করলে মনে হয় নাট্যকার পরমেশ্বরকে প্রণাম জানিয়ে নান্দীর অবতারণা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর অন্তরালে নাটকের প্রধান চরিত্র রামের বীরত্ব প্রকাশিত হয়েছে। পরশুরামের মত বীরকে যিনি পরাজিত করেছেন। বালী, রাবণ এমনকি সমগ্র রাক্ষসকুলকে যিনি নিধন করেছেন সেই রামকে প্রণাম জানিয়ে এবং মঙ্গল কামনা করে নান্দী শ্লোকের অবতারণা করেছেন নাট্যকার।

সূত্রধার: যিনি সূত্র ধারণ করেন তিনিই সূত্রধার। যিনি নাটকীয় কথাসূত্র ধারণ করেন তিনিই সূত্রধার। নাটকে সূত্রধার হবেন যিনি নাট্যকারের সঙ্গে দর্শকের পরিচিতি ঘটান, যিনি নাটকের সূত্রপাত করেন তিনিই সূত্রধার। সাধারণভাবে সূত্রধার তাঁর স্ত্রী বা নট অর্থাৎ সহ-অভিনেতাকে সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে এসে নাটকের সূচনা করে চলে যান। *মহাবীরচরিত* নাটকের নান্দীশেষে সূত্রধার আর নটের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাটকের সূচনা হয়। তবে ভবভূতির অন্য দুটি নাটক *মালতীমাধব* এবং *উত্তররামচরিত* নাটকের সূত্রধার নাট্যসূচনা ছাড়াও অভিনেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। নান্দীর পরই প্রস্তাবনা, যার অভিধানিক অর্থ ঘোষণা। মুখ্যত, কোন নাট্যকাব্যটি অভিনীত হবে তার ঘোষণাই প্রস্তাবনা। অর্থাৎ নাটকের যে অংশে নটী, বিদূষক বা পারিপার্শ্বিক সূত্রধারের সঙ্গে নটী (সূত্রধারের স্ত্রী) অথবা নটের (অভিনেতার) সঙ্গে কথোপকথনের স্নারা যেভাবে নাটকের শুরু হয় তাকে প্রস্তাবনা বা আমুখ বলে।[৮] প্রস্তাবনার মাধ্যমেই মূল পাত্রপাত্রীর মঞ্চে প্রবেশ ঘটানো হয়। পাত্রপাত্রীর প্রবেশ করানোর মধ্যেই প্রস্তাবনার প্রকৃত কারুকার্য নিহিত। প্রস্তাবনাকে *নাট্যশাস্ত্রে* পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা— উদ্‌ঘাত্যক, কথোদ্‌ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্তক ও অবলগিত। *মহাবীরচরিত* নাটকে প্রয়োগাতিশয় প্রস্তাবনা ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বাকী প্রস্তাবনাগুলোর শুধু সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

উদ্‌ঘাত্যক: প্রবেশকারী পাত্রগণ যখন অনিশ্চিত অর্থযুক্ত পদসমূহকে অর্থবোধের জন্য অন্য পদসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত করেন তখন উদ্‌ঘাত্যক প্রস্তাবনা হয়েছে বলা হয়।[৯]

কথোদ্‌ঘাত: সূত্রধারের বাক্য বা তার অর্থ গ্রহণ করে পাত্র প্রবেশ হলে, তাকে কথোদ্‌ঘাত বলে।[১০]

প্রয়োগাতিশয়: একটি প্রসঙ্গ প্রযুক্ত হয়েছে এমন অবস্থায় যদি অন্য প্রসঙ্গের প্রয়োগ-পূর্বক পাত্র প্রবেশ হয়, তাহলে তাকে প্রয়োগাতিশয় বলে।[১১] যেমন— *মহাবীরচরিত* নাটকে প্রয়োগাতিশয় প্রস্তাবনা ব্যবহৃত হয়েছে। নান্দী শেষে সূত্রধার

যথাবিধি নাটকের নাম (মহাবীরচরিত) এবং তার সম্পর্কিত কিছু বক্তব্য জানিয়ে নাট্যকারের পরিচয় দেন। কোন উৎসবে নাটকটি মঞ্চস্থ হবে তিনি তাও বলেছেন। বিদগ্ধজন তাঁর নাট্যপরিবেশনা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবেন, এটাই সূত্রধারের কাজ। এসময়ে নট প্রবেশ করে জানালেন, নাট্যবস্তুর নতুনত্বের জন্য সভ্যবৃন্দ প্রারম্ভেই কিছু কথা জানাতে চান। তখন সূত্রধার প্রারম্ভিক কথা বলেন। এরপর নাটকের মূল চরিত্রদের প্রবেশ ঘটে।[১২] এভাবেই এটা প্রয়োগাতিশয় প্রস্তাবনা হয়েছে।

প্রবর্তক: যেখানে সূত্রধার তৎকালে বিদ্যমান ঋতুর বর্ণনা করেন ও সেই বর্ণনার আশ্রয়ে পাত্র প্রবেশ হয়, সেখানে প্রবর্তক প্রস্তাবনা হয়।[১৩]

অবলগিত: যেখানে এক বিষয়ের সমাবেশ হতে অন্য কার্যের অবতারণা করা হয়, সেখানে পণ্ডিতগণ সেই প্রস্তাবনাকে অবলগিত নামে অভিহিত করেন।[১৪]

প্রস্তাবনার পর মূল কাহিনি বিন্যাস। নাটকের মূল কাহিনি বিন্যাসের ক্ষেত্রে অর্থোপক্ষেপক, অর্থপ্রকৃতি, কার্যাবস্থা, সন্ধি— এই নাট্যাঙ্গিকগুলোর প্রয়োগ হয়। অর্থোপক্ষেক হলো বিষয়বস্তুর উপস্থাপক। নাটকে দীর্ঘক্ষণ বা দীর্ঘ সময়ব্যাপী ঘটনা মঞ্চে দেখানোর সুযোগ নেই। আবার অশ্লীল বা অরমণীয় বিষয়গুলি ভারতীয় নাট্যতত্ত্ব অনুসারে মঞ্চে সরাসরি দেখানো নিষিদ্ধ। যেমন— দূর হতে আহ্বান, যুদ্ধ, হত্যা, দেশদ্রোহ, রাজ্যবিপ্লব, বিবাহ, ভোজন, শাপ, মৃত্যু, রতিক্রীড়া, দন্তচ্ছেদ, নখাঘাত, শয়ন, অধরপান, বিভিন্ন লজ্জাকর কার্য, নগর-অবরোধ, স্নান, প্রসাদন, অনুলেপন প্রভৃতি মঞ্চে সরাসরি দেখানো যাবে না এবং এ বিষয়ের আলোচনা অতি-বিস্তৃত করা যাবে না। এগুলোকে বলা হয় সূচ্য-অংশ। অর্থোপক্ষেপকের মাধ্যমে এই সূচ্য-অংশগুলোকে পাত্রপাত্রী দ্বারা সংবাদরূপে উপস্থাপন করা হয়। যে বস্তু এক বছরের বেশি সময়ে সংঘটিত হয়েছে, তা এক বছরের মধ্যে ঘটেছে বলতে হবে।[১৫] নাটকে পাঁচ শ্রেণির অর্থোপক্ষেপক রয়েছে, যথা— বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, চূলিকা, অঙ্কাবতার ও অঙ্কমুখ।

বিষ্কম্ভক: যা ভূত ও ভবিষ্যৎ কথাংশের নির্দেশক, সংক্ষিপ্তার্থ এবং অঙ্কের প্রথমে প্রযুক্ত হয় তা বিষ্কম্ভক। একটি বা দুটি মধ্যম পাত্রের প্রয়োগ থাকলে শুদ্ধ বিষ্কম্ভক হয় এবং নিচ ও মধ্যম এই দু'প্রকার পাত্রের প্রয়োগ থাকলে সংকীর্ণ বা মিশ্র বিষ্কম্ভক হয়। শুদ্ধ বিষ্কম্ভকে পাত্র-পাত্রী সংস্কৃত ভাষায় কথা বলে এবং সংকীর্ণ বা মিশ্র বিষ্কম্ভকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষাতেই কথা বলে।[১৬] বিষ্কম্ভক ব্যবহৃত হয় অঙ্কের শুরুতে। *মহাবীরচরিত* নাটকে বিষ্কম্ভক ব্যবহৃত হয়েছে বহুবার। তার মধ্যে একটি বিষ্কম্ভকের উদাহরণ তুলে ধরা হল। যেমন— *মহাবীরচরিত* নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতে রাবণের মন্ত্রী মাল্যবান এবং শূর্পনখার কথোপকথনে মিশ্র বিষ্কম্ভক ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের কথোপকথনের মাধ্যমে পাঠক ও দর্শক নাটকের ভূত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে পারে। মাল্যবানের কাছ থেকে জানা যায় যে রাম তাটকাপুত্র মারীচ ও সুবাহুকে নিহত করেছেন এবং তিনি হরধনু ভঙ্গ করেছেন। আবার মাল্যবান শূর্পণখাকে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানায় যে, শিবভক্ত পরশুরামকে রামের হরধনু ভঙ্গের কথা বলে ক্ষিপ্ত করে তুলতে পারলেই রামকে নিধন করা সম্ভব হবে।

প্রবেশক: বিষ্কম্ভকের লক্ষণ অনুসরণ করে হীনবাক্য ও নিম্নশ্রেণির পাত্র-পাত্রীর মাধ্যমে এবং দু'টি অঙ্কের মাঝে যদি আলোচ্য বিষয় উপস্থাপিত হয় তবে তাকে প্রবেশক বলে।[১৭] *মহাবীরচরিত* নাটকে কোন প্রবেশক নেই।

চূলিকা: যবনিকার অন্তরাল হতে পাত্র-পাত্রীর মাধ্যমে কোন বিষয় সূচিত হলে তাকে চূলিকা বলা হয়।[১৮]যেমন— *মহাবীরচরিত* নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বিষ্কম্ভক অংশ শেষে মাল্যবান ও শূর্পণখা মঞ্চ থেকে প্রস্থান করলে রামকে নেপথ্য থেকে জানানো হয় পরশুরামের আগমন সম্পর্কে। এরপর রাম, সীতা ও সখীদের প্রবেশ ঘটে মঞ্চে। এভাবে মঞ্চের অন্তরাল থেকে বক্তব্য সূচিত হওয়ায় চূলিকা হয়েছে।

অঙ্কাবতার: কোন অঙ্কের শেষে যেখানে পরবর্তী অঙ্কের অবিচ্ছিন্ন অংশরূপে বিষয়বস্তুর অবতারণা হয়, পণ্ডিতদের মতে অঙ্কের সেই অংশকে অঙ্কাবতার বলা হয়।[১৯] *মহাবীরচরিত* নাটকে কোন অঙ্কাবতার নেই।

অঙ্কমুখ: যার দ্বারা একই অঙ্কে সমস্ত অঙ্কের বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরা হয় এবং যা বীজার্থখ্যাপক তাকে অঙ্কমুখ বলে।[২০] *মহাবীরচরিত* নাটকে কোন অঙ্কমুখ নেই।

আবার নাট্যকাহিনির উত্থান-পতন ও দর্শকদের আশা-উৎকণ্ঠা প্রভৃতি বজায় রাখার ভিতর দিয়ে নাট্যকাহিনির স্রোতকে অবিচ্ছিন্ন রাখা প্রয়োজন। সেজন্য নাটকের মূল কাহিনিতে অর্থপ্রকৃতি, কার্যাবস্থা ও সন্ধির প্রয়োগ হয়। অর্থপ্রকৃতি হলো নাট্যপ্রয়োজন সিদ্ধির হেতু— "অর্থপ্রকৃতয়ঃ প্রয়োজনসিদ্ধিহেতবঃ।" [২১] অর্থপ্রকৃতি পাঁচটি— বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য।[২২]

বীজ: অল্পমাত্র প্রদর্শিত হলেও নাটকের ফল লাভ পর্যন্ত যা বহুভাবে বিস্তার লাভ করে তাকে 'বীজ' বলে।[২৩] যেমন— প্রথম অঙ্কে বিশ্বামিত্র কর্তৃক রাম-সীতার বিবাহের প্রযত্ন *মহাবীরচরিত* নাটকের বীজ।

বিন্দু: অবান্তর কথার দ্বারা অর্থবিচ্ছেদ হলেও যা (প্রধান বস্তুর) অবিচ্ছেদেরও কারণ, তা বিন্দু।[২৪]

বিন্দু অনেকটা তৈল বিন্দুর মতো যা জলের উপর ভেসে থাকে। বিন্দু হলো এমন একটা বিষয় যা নাটকের মূল ঘটনাকে কখনও বিচ্ছিন্ন হতে দেয় না। যেমন—*মহাবীরচরিত* নাটকে মাল্যবানের ষড়যন্ত্র, যার মূল লক্ষ্য হলো রামকে হত্যা করা (পরিশেষে রাম-রাবণের যুদ্ধ), এটাকে বলা যায় বিন্দু। এ বিষয়টা কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি। নাটকের প্রধান বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে।

পতাকা: শেষ পর্যন্ত ব্যাপ্ত এবং প্রাসঙ্গিক যে বৃত্তান্ত তাকে পতাকা বলে।[২৫] যেমন— বিভীষণ ও সুগ্রীবের চরিত্র *মহাবীরচরিত* নাটকের পতাকা অংশ। পতাকা-নায়কের নিজের কোন পৃথক ফল হয় না; তার নিজের প্রয়োজন গর্ভসন্ধি বা বিমর্ষ সন্ধিতেই শেষ হয়। যেমন— সুগ্রীবাদির রাজ্যপ্রাপ্তি। ভরতমুনি বলেছেন— গর্ভসন্ধি বা বিমর্ষ সন্ধিতেই পতাকার সমাপ্তি হয়। সেখানে পতাকা শব্দের ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্তপাদ বলেছেন— পতাকা হলো নায়কের ফল; কারণ নির্বহনসন্ধি পর্যন্ত পতাকার অবস্থান দেখা যায়।[২৬]

প্রকরী: নাটকের অংশবিশেষে স্থিত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তকে প্রকরী বলা হয়।[২৭] যেমন— *মহাবীরচরিত* নাটকের পঞ্চম অঙ্কে নাটকের অংশবিশেষে স্থিত সুগ্রীব ও বিভীষণের বৃত্তান্ত প্রকরী।

কার্য: যে সাধ্যবস্তু অপেক্ষিত (অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষিত কিন্তু প্রাসঙ্গিক নয়), যার উদ্দেশ্যে ব্যাপার-প্রবৃত্তি এবং যা সিদ্ধ করবার জন্য সামগ্রীর আয়োজন–তাকে কার্য বলে।[২৮] যেমন— *মহাবীরচরিত* নাটকের কার্য রাম কর্তৃক রাবণ বধ। হেতু বা কারণ প্রয়োগ হওয়ার পর নাট্যকাব্যে মুখ্য কর্মকর্তা পুরুষের যে মানসিক পরিবর্তন ঘটে, সেটাই কার্যাবস্থা [২৯]। এই কার্যাবস্থা পাঁচটি। যথা— আরম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম।

আরম্ভ: মুখ্যফল সিদ্ধির জন্য যে ঔৎসুক্য, তা হলো আরম্ভ।[৩০] যেমন— *মহাবীরচরিত* নাটকের প্রথম অঙ্কে আশ্রমে বিশ্বামিত্র মুনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই রামকে নিয়ে আসেন। তার উদ্দেশ্য হলো রাম–সীতার বিবাহকার্য সম্পন্ন করা, যজ্ঞ সম্পন্ন করা রামরূপী বিষ্ণুর চরিত প্রকাশ করা। আশ্রমে রাম–সীতা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। এখানে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে কাহিনি এগিয়ে যেতে থাকে। একপর্যায়ে সেখানে আসে ভীমদর্শনা তাটকা। বিশ্বামিত্র মুনির আদেশে রাম তাকে হত্যা করলেন। এঘটনাকে নাটকীয় ক্রিয়ার আরম্ভ বলা হয়। অর্থাৎ মুখ্যফল সিদ্ধির জন্য বিশ্বামিত্র মুনির এই ঔৎসুক্য হলো 'আরম্ভ' রূপ কার্যাবস্থা।

প্রযত্ন: ফলপ্রাপ্তির জন্য অতিত্বরান্বিত চেষ্টাকে প্রযত্ন বলে।[৩১] যেমন— *মহাবীরচরিত* নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে রাম হরধনু ভেঙ্গে সীতাকে বিবাহ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। ফলে রাম-সীতার বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মাল্যবানের মাধ্যমে রাম হরধনু ভেঙ্গেছে একথা শুনে পরশুরাম ভেবেছেন তিনি মহাদেব শিবকে অবমাননা করেছেন। তাই ক্ষিপ্ত হয়ে পরশুরাম রামকে বধ করার জন্য মিথিলায় গমন করেন। মাল্যবান পরশুরামকে দিয়ে রামকে বধ করার জন্য যে নতুন পরিকল্পনা করেছেন তা ফলপ্রাপ্তির জন্য অতিত্বরান্বিত চেষ্টা হওয়ায় 'প্রযত্ন' রূপ কার্যাব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রত্যাশা/প্রাপ্ত্যাশা: উপায় ও অপায় শঙ্কার মধ্যে যেখানে ফল-লাভের সম্ভাবনা থাকে, সেখানে প্রত্যাশা/প্রাপ্ত্যাশা হয়।[৩২] যেমন— *মহাবীরচরিত* নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে রাম হরধনু ভেঙ্গে মহাদেব শিবকে অবমাননা করেছেন একথা ভেবে ক্ষিপ্ত পরশুরাম রামকে বধ করার জন্য মিথিলায় গমন করেন। কিন্তু রামের বিনয়ী আচরণ দেখে তিনি বলে ওঠেন— সাধু রাজপুত্র, সাধু। সত্যিই তুমি ইক্ষ্বাকুকুলজাত।[৩৩] কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয় রাম-পরশুরামের বাক্-বিতণ্ডা। কুলগুরু বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র মুনি, গৌতমপুত্র শতানন্দ, মিথিলার রাজা জনক, অযোধ্যার রাজা দশরথ–সকলে বুঝিয়েও পরশুরামকে শান্ত করতে পারলেন না। কিন্তু অবশেষে রামের কাছে পরশুরাম পরাজিত হলেন। রামের কাছে পরশুরামের পরাজিত হওয়ায় উপায় এবং রামের সাথে ক্ষিপ্ত পরশুরামের বাক্-বিতণ্ডা হল অপায়। আর এই উপায় ও অপায় শঙ্কার মধ্যে ফল-লাভের সম্ভাবনা থাকায় এখানে 'প্রত্যাশা/প্রাপ্ত্যাশা' রূপ কার্যাব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে।

নিয়তাপ্তি: অপায়ের অভাবহেতু অর্থাৎ বাধা অপসারিত হওয়ার পর নিশ্চিত ফলপ্রাপ্তিকে নিয়তাপ্তি বলে।[৩৪] যেমন— *মহাবীরচরিত* নাটকের চতুর্থ অঙ্কে কৈকেয়ীর মাতার ইচ্ছানুযায়ী রাম চৌদ্দ বছরের জন্য বনে চলে গেলেন, তাঁর সাথে গেলেন সীতাদেবী ও লক্ষ্মণ। এসময় একের পর এক বাধাবিঘ্ন আসতে থাকল। পঞ্চম অঙ্কে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, রামকর্তৃক ইন্দ্রপুত্র বালীবধ এবং সুগ্রীব ও রাবণের ভ্রাতা বিভীষণের সাথে রামের বন্ধুত্ব স্থাপন। সকল অপায় বা বিঘ্ন কাটিয়ে রাম বালীকে বধ করায় নিশ্চিত ফলপ্রাপ্তির দিকে ধাবিত হওয়ায় এখানে 'নিয়তাপ্তি' রূপ কার্যাব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে।

ফলাগম/ফলযোগ: যে অবস্থায় সমগ্র ফলের উদয় হয়, তাকে ফলাগম/ফলযোগ বলে।[৩৫] যেমন— *মহাবীরচরিত* নাটকে রাবণের পরাজয় ও মৃত্যু হচ্ছে ফলাগম/ফলযোগ।

নাট্যকাহিনির উত্থান-পতন থাকে। কাহিনি একদিকে প্রশস্ত হয়, আবার প্রয়োজনে অন্যদিকে বাঁক নেয়। কাহিনির প্রত্যেকটি বাঁক পরবর্তী বাঁকের সাথে সংযোগ করার প্রয়োজন হয়। এই সংযোগকেই সন্ধি[২৭] বলে। যেমন— বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য— এই পঞ্চ অর্থপ্রকৃতির সাথে যথাক্রমে প্রারম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম— এই পঞ্চ কার্যাবস্থা যুক্ত হয়ে পর্যায়ক্রমে মুখসন্ধি, প্রতিমুখসন্ধি, গর্ভসন্ধি, বিমর্ষসন্ধি ও উপসংহৃতি বা নির্বহণসন্ধি সৃষ্টি করে।

মুখসন্ধিঃ অনেক অর্থযুক্ত ও রসসমন্বিত বীজের উৎপত্তি যেখানে হয় এবং যা প্রারম্ভ-যুক্ত, তাই মুখসন্ধি।[৩৬] যেমন— *মহাবীরচরিত* নাটকে সীতার প্রতি রামের আকর্ষণ, সীতারও রামের প্রতি আকর্ষণকে বলা যায় নাট্যবীজ। একই সঙ্গে রাবণকে হত্যার কথা বলাও নাট্যবীজ হিসেরে অভিহিত হতে পারে। মূলত এটাই নাটকের বীজ। এখান থেকে নাট্যঘটনার আরম্ভ। এ সবকিছু মিলে *মহাবীরচরিত* নাটকের প্রথম অঙ্ককে বলা যায় মুখসন্ধি।

প্রতিমুখ-সন্ধিঃ মুখসন্ধিতে সন্নিবিষ্ট মুখ্যফললাভের উপায় কিছুটা লক্ষিত ও কিছুটা অলক্ষিত হয়ে যেখানে প্রথম প্রকাশিত হয়, তাকে প্রতিমুখ-সন্ধি বলে।[৩৭] যেমন— *মহাবীরচরিত* নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে বিষ্কম্ভকে মাল্যবানের ষড়যন্ত্রের কথা এবং পরে পরশুরামের আগমন-সবকিছুতে একটা বিপর্যস্তভাব। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে বিবাহের মঙ্গলসূত্র মোচনের সংবাদ নিয়ে কঞ্চুকী এলেন। এবার রামকে যেতে হবে। কঠোর পরশুরামও এই মাঙ্গলিক কাজে রামকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। ফলে নাট্যবীজ ধ্বংসের আশঙ্কা কমে গেল। বিন্দুও সফল। কিন্তু পরশুরাম রামের সঙ্গে যুদ্ধ করবেনই। তিনি রামকে দ্রুত ফিরে আসতে বললেন। কিছুটা লক্ষিত ও অলক্ষিত মুখ্যফললাভের উপায় সংবলিত সমগ্র দ্বিতীয়াঙ্ক প্রতিমুখ-সন্ধি। তৃতীয়াঙ্কতেও প্রতিমুখ-সন্ধির ব্যাপ্তি এবং পরে গর্ভসন্ধির সূচনা।

গর্ভসন্ধিঃ যেখানে পূর্বসন্ধিতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রকাশিত মুখ্য ফলোপায়ের পুনঃ পুনঃহ্রাস ও অন্বেষণযুক্ত অভিব্যক্তি হয়, সেখানে গর্ভসন্ধি হয়ে থাকে।[৩৮] যেমন— *মহাবীরচরিত* নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রথমেই জানা গেল, রাম পরশুরামকে পরাজিত করেছেন। রাম-সীতার বিবাহ মঙ্গলমত অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফলে আবার সবকিছু স্বাভাবিক। মুখ্যফললাভের দিকে নাট্যঘটনার শুভ যাত্রা। কিন্তু পরক্ষণেই পুনরায় বিপর্যয়। মাল্যবানের ষড়যন্ত্র হিসেবে মন্থরার শরীরে শূর্পণখার প্রবেশ এবং শেষে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের বনগমন। *মহাবীরচরিত* নাটকের সমগ্র চতুর্থ অঙ্কই গর্ভসন্ধি।

বিমর্ষসন্ধিঃ যেখানে মুখ্যফলের উপায় গর্ভসন্ধি অপেক্ষা অধিক বিকশিত অথচ অভিশাপ প্রভৃতির স্নারা বাধাযুক্ত হয় সেখানে বিমর্ষসন্ধি হয়।[৩৯] যেমন— *মহাবীরচরিত* নাটকের পঞ্চম অঙ্কের প্রথমেই নানা বিপর্যয় দেখা যায়। তবে শেষে বালীবধের মধ্য দিয়ে মুখ্যফললাভ অধিক বিকশিত। *মহাবীরচরিত* নাটকের সমগ্র পঞ্চম অঙ্কই বিমর্ষসন্ধি ।

নির্বহণ-সন্ধিঃ যথাযথভাবে মুখাদি-সন্ধিতে বিন্যস্ত বীজযুক্ত বিষয়সমূহ যখন একার্থে উপনীত হয়, তখন তাকে নির্বহণ-সন্ধি বলে।[৪০] যেমন— *মহাবীরচরিত* নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে সমুদ্রবন্ধন করে রাম ও বানরসৈন্যগণ সমগ্র লঙ্কা পরিবেষ্টিত করে রাখে। রাম কর্তৃক রাবণবধ তথা রাক্ষসকুল নিধনের এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের মধ্য দিয়ে নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের সমাপ্তি ঘটে। এরপর সপ্তম অঙ্কে লঙ্কাপুরীর ধ্বংসাবশেষ, বিভীষণের রাজ্যলাভ, রাম প্রমুখদের অযোধ্যায় গমন, সীতার অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজের শুচিতার প্রমাণ দেওয়া এবং পরিশেষে গুরুজনদের আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে নাটকের শুভ সমাপ্তি ঘটে। সকল বাধাবিঘ্ন দূরীভূত হয়ে নিশ্চিত ফললাভ হয় এ অঙ্কদ্বয়ে। তাই সমগ্র ষষ্ঠ ও সপ্তম অঙ্ক নির্বহণ-সন্ধি।

নাটকের সমাপ্তিতে থাকে প্রশস্তি[৪১]। এর অপর নাম ভরতবাক্য। মহর্ষি ভরতের নামানুসারে এর নাম ভরতবাক্য। এর মাধ্যমে দেশ, জাতি ও রাজার কল্যাণ কামনায় একটি বিশেষ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটে, এই বিশেষ প্রার্থনাকে ভরতবাক্য বলা হয়। সাধারণত নাটকের প্রধান চরিত্র এটি পাঠ করে থাকেন। আবার ভরত শব্দের একটি অর্থ অভিনেতা। তাই ভরতবাক্য স্নারা বোঝায় অভিনেতাদের বাক্য। যেমন— *মহাবীরচরিত* নাটকের ভরতবাক্য পাঠ করেন নায়ক রাম— তিনি বলেন, রাজারা অতন্দ্র হয়ে পৃথিবীকে রক্ষা করুন, মেঘ যথাকালে বর্ষণ করুক, সমগ্র রাজ্য শস্য-সমৃদ্ধ হোক, দূর হোক শস্যবিঘ্ন। কবিরা প্রসাদগুণে মণ্ডিত আনন্দপ্রদ কাব্য রচনা করুন, আর পণ্ডিতেরাও অন্যের রচনা উপভোগ করে নন্দিত হোন।[৪২]

এবার রস বিচার। নাট্যশাস্ত্রের প্রবক্তা ভরতমুনির মতে রস হল—'আস্বাদ্যত্বাৎ'।[৪৩] সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে, 'রস্যতে ইতি রসঃ', [৪৪] অর্থাৎ যা আস্বাদন করা হয় তাই রস। বস্তুত পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভাবকে আত্মীয়করণ-পূর্বক কাব্যকারকর্তৃক রচিত কাব্য পঠনে, শ্রবণে অথবা দর্শনে পাঠক, শ্রাবক বা দর্শকের হৃদয়ে যে অনুভূতির আস্বাদন, সেটাই রস। ভরতমুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে চারটি প্রধান রসের কথা উল্লেখ করেন— শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস। এই চারটি রসের মধ্যে শৃঙ্গার থেকে হাস্য, রৌদ্র থেকে করুণ, বীর থেকে অদ্ভুত এবং বীভৎস থেকে ভয়ানক রসের উৎপত্তি। সুতরাং ভারতমুনির মতে রস আটটি। কিন্তু সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ এই আটটি রসের সঙ্গে শান্ত নামে আরেকটি রস যোগ করে নয়টি রসের কথা বলেছেন। *মহাবীরচরিত* নাটকের প্রধান রস বীররস। কিন্তু বীররস ছাড়াও নাটকটিতে শৃঙ্গার, করুণ, বীভৎস ও ভয়ানক রস ব্যবহৃত হয়েছে। এ নাটকের প্রথমাঙ্কে সীতাকে প্রথম দেখে এবং দ্বিতীয় অঙ্কে পরশুরামের সামনে যাওয়ার পূর্বে সীতার নৈকট্য ত্যাগ করতে রামের অভিব্যক্তিতে শৃঙ্গার রস ব্যবহৃত হয়েছে। ষষ্ঠাঙ্কে রামের উক্তিতেও শৃঙ্গার রসের আভাস মেলে— যদি সীতার আনন থাকে, তবে কী দরকার চন্দ্রের? নীলকমলগুলোর কী প্রয়োজন, যদি তার চঞ্চল অপাঙ্গময় দুটি নয়ন থাকে? তরঙ্গেরে মতো বক্র ভ্রূ দুটি থাকতে কী দরকার কামদেবের ধনুতে? যদি তার সুসংগত কুন্তলদাম থাকে, মেঘমালায় কী প্রয়োজন? এই যদি তার দেহ, তবে কী দরকার লক্ষ্মীতে?[৪৫] নাটকের পঞ্চম অঙ্কে সীতাহরণ হওয়ার পর রামচন্দ্র বিলাপ করে বলেন, সীতাহরণের অপমান বজ্রকীলকের মতো বিদ্ধ করছে আমার হৃদয়।

আমার মন লজ্জায় সংকুচিত হয়ে ডুবে যাচ্ছে গাঢ় অন্ধকারে। পূজনীয় জটায়ুর মৃত্যুশোক আমাকে দগ্ধ করছে, যে শোকের কোনো প্রতিকার নেই। আর দুর্ভাগা সীতার প্রতি করুণা যেন আমার মর্মস্থল বিদীর্ণ করছে।[৪৬] রামের এ উক্তিটি করুণ রসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আবার সপ্তম অঙ্কে লঙ্কা ও অলকার কথোপকথনে লঙ্কাপুরীর করুণ পরিণতির বর্ণনায় করুণ রসের প্রয়োগ হয়েছে। নাটকের ষষ্ঠাঙ্কে রাম-লক্ষ্মণ ও রাবণ-কুম্ভকর্ণের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। আকাশ থেকে তা পর্যবেক্ষণ করছেন দেবরাজ ইন্দ্র ও গান্ধর্বরাজ চিত্ররথ। যুদ্ধের একপর্যায়ে দেবরাজ ইন্দ্র গান্ধর্বরাজকে বলেন, সৈন্যদের চামড়া ছিঁড়ে গেছে, মাংস কেটে বেরিয়ে গেছে, ফুটে বেরিয়ে পড়েছে ধমনী, বড়ো বড়ো হাড় আর স্নায়ু; ফলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব নাড়িভূড়ি, এই অবস্থায় বীরেরা সময়োচিত ধৈর্য ধরে সামনে এসে শত্রুদের অস্ত্র বুক দিয়ে সবেগে গ্রহণ করছে।[৪৭] এই উক্তিটিতে বীভৎস রসের প্রয়োগ হয়েছে। নাটকের ষষ্ঠাঙ্কে যুদ্ধকালের বর্ণনায় ভয়ানক রসের ব্যবহার হয়েছে। যেমন— লঙ্কায় যে প্রলয়কালে সাত-সমুদ্র ভীষণ আবর্তিত হলে তাদের তরঙ্গমালা পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়; তাতে জল অত্যন্ত ঘুরতে থাকায় যেমন প্রচণ্ড নির্ঘোষ সেইরকম ভীষণ কোলাহল করছে সহস্রাধিক রাক্ষস। তারা এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছে, রণস্থলের দিকে দ্রুত যাচ্ছে আর আসছে।[৪৮] পরশুরামের প্রতি জনক, শতানন্দ ও দশরথের ক্রোধের অভিব্যক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে রৌদ্র রস। বশিষ্ঠের আচরণে শান্ত রস অবস্থিত। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে পরশুরামের বক্তব্যে বীররস অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য অঙ্কেও বীর রসের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন— রাম ও বালীর যুদ্ধে, রাম-লক্ষ্মণ-বিভীষণ-সুগ্রীব ও তার সৈন্যগণ লঙ্কাপুরী আক্রমণের পর রাবণের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে বীররসের বর্ণনা পাওয়া যায়। নাট্যকার ভবভূতি *মহাবীরচরিত* নাটকে বিভিন্ন রসের প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু এ নাটকে বীররসের বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। নাটকের শুরুতে সূত্রধারের উক্তির মাধ্যমেও বীররসের প্রাধান্যর কথা উল্লেখ করা হয়েছে— এ রচনায় রাম-পরশুরাম প্রমুখ অসাধারণ চরিত্রগুলিতে বর্ণনীয়রূপে থাকবে বীররস।[৪৯]

মহাবীরচরিত নাটকের কাহিনি রামায়ণনির্ভর হওয়ায় অবশ্যই তা বিখ্যাত। সাত অঙ্কবিশিষ্ট এই নাটকের কাহিনি সুখ-দুঃখে পরিপূর্ণ, নায়ক রাম অযোধ্যার বিখ্যাত সূর্যবংশীয় রাজা। আলঙ্কারিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ধীরোদাত্ত শ্রেণির নায়ক।। বীররস *মহাবীরচরিত* নাটকের অঙ্গীরস (প্রধান রস)। বীররসের পাশাপাশি অন্যান্য রসও অঙ্গরস (অপ্রধান রস) হিসেবে আছে। 'নাটক' শ্রেণির রূপকের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকায় *মহাবীরচরিত* নাটককে 'নাটক' শ্রেণির রূপক বলা যায়।

পরিশেষে বলা যায় নাট্যকাহিনির উৎস, কাহিনির বিন্যাস, রস, চরিত্র, নান্দী, প্রস্তাবনা, অর্থোপক্ষেপক, অর্থপ্রকৃতি, পঞ্চাবস্থা ও পঞ্চসন্ধি— এই কয়টি দিক বিবেচনা করে সংস্কৃত *মহাবীরচরিত* নাটকের স্বরূপ নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। নান্দী ও ভরতবাক্য প্রয়োগের মাধ্যমে দেব, দ্বিজ, নৃপসহ দেশের মঙ্গল কামনা করা হয়েছে। প্রস্তাবনায় নিজেদের প্রশংসাস্তুতি শুনে দর্শকেরা গর্বিত হয়েছে এবং সেখানে বিচিত্র রসের প্রয়োগ, গূঢ় ও রহস্যময় বাক্যের ব্যবহার এবং নাট্যবিষয়বস্তুর প্রতি আগাম ইঙ্গিত প্রদানের মাধ্যমে দর্শকের মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থোপক্ষেপক প্রয়োগের মাধ্যমে নাটকের অরমনীয় অংশ পরিহার করা হয়েছে। অর্থপ্রকৃতি ও কার্যাবস্থার শোভন সম্মিলনে সৃষ্ট সন্ধির প্রয়োগে নাট্যগতির উত্থান-পতন ঘটেছে, কাহিনি কখনো বিস্তৃত হয়ে পড়লেও প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নাটকীয়ভাবে তা কেন্দ্রিভূত হয়েছে। ফলে একঘেয়েমি মুক্ত নাটক দর্শককে অধিকতর আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

[১] "শ্রব্যং শ্রোতব্যমাত্রং ....." বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণ*, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পা. (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ), ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৮৮।

[২] "দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ং....."— *তদেব*, পৃ. ২৮১।

[৩] *তদেব*, ৬/১।

[৪] *তদেব*, ৬/৭-১১।

[৫] *তদেব*, ৬/২১।

[৬] *তদেব*, ৬/২৪-২৫।

[৭] ভবভূতি, *মহাবীরচরিতম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১৩*শ খণ্ড*, গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), তারাপদ ভট্টাচার্য সম্পা. (কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, আগস্ট, ১৯৮২), ১/১।

[৮] বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণ*, *প্রাগুক্ত*, ৬/৩১-৩২।

[৯] *তদেব*, ৬/৩৪।

[১০] *তদেব*, ৬/৩৫।

[১১] *তদেব*, ৬/৩৬।

[১২] ভবভূতি, *মহাবীরচরিতম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১৩*শ খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, ১/৬-৯।

[১৩] বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণ*, *প্রাগুক্ত*, ৬/৩৭।

[১৪] *তদেব*, ৬/৩৮।

[১৫] *তদেব*, ৬/৫১-৫২।

[১৬] *তদেব*, ৬/৫৫-৫৬।

[১৭] *তদেব*, ৬/৫৭।
[১৮] *তদেব*, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৫৭।
[১৯] *তদেব*, ৬/৫৮।
[২০] *তদেব*, ৬/৫৯।
[২১] *তদেব*, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৬০।
[২২] *তদেব*, ৬/৬৪।
[২৩] *তদেব*, ৬/৬৫।
[২৪] *তদেব*, ৬/৬৬।
[২৫] *তদেব*, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃ.৩৬১।
[২৬] *তদেব*, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃ.৩৬১।
[২৭] *তদেব*, ৬/৬৮।
[২৮] *তদেব*, ৬/৬৯।
[২৯] ধনঞ্জয়, *দশরূপক*, ড. সীতানাথ আচার্য ও ড. দেব কুমার দাস সম্পাদিত (কলকাতা: সংকৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম সংস্করণ, আগস্ট, ১৯৯৭), ১/২০।
[৩০] বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণ*, *প্রাগুক্ত*, ৬/৭১।
[৩১] *তদেব*,ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৬৩।
[৩২] *তদেব*, ৬/৭২।
[৩৩] ভবভূতি, *মহাবীরচরিতম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, *১৩শ খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, দ্বিতীয় অঙ্ক, পৃ. ৫৮।
[৩৪] বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণ*, *প্রাগুক্ত*, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৬৪।
[৩৫] *তদেব*, ৬/৭৩।
[৩৬] *তদেব*, ৬/৭৬।
[৩৭] *তদেব*, ৬/৭৭।
[৩৮] *তদেব*, ৬/৭৮।
[৩৯] *তদেব*, ৬/৭৯।
[৪০] *তদেব*, ৬/৮০।
[৪১] সাগরনন্দী, *নাটকলক্ষণরত্নকোশ*, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা: সস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, ১ম প্রকাশ, ১৩৮৫), পৃ. ১১৫।
[৪২] ভবভূতি, *মহাবীরচরিতম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, *১৩শ খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, ৭/৪২।
[৪৩] ভরত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ১৪ই মার্চ, ১৯৮০), পৃ. ১৩৬।
[৪৪] বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণ*, *প্রাগুক্ত*, ১/৩।
[৪৫] ভবভূতি, *মহাবীরচরিতম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, *১৩শ খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, ৬/৯।
[৪৬] বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণ*, *প্রাগুক্ত*, ৫/২২।
[৪৭] *তদেব*, ৬/৩৪।
[৪৮] *তদেব*, ৬/২৬।
[৪৯] ভবভূতি, *মহাবীরচরিতম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, *১৩শ খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, ১/৩।